জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়?

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া :

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ মুসলামনদের দ্বীন ঈমান, ইজ্জত আব্রু, ভূখণ্ড ও ধন সম্পদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য যেই পরিমাণ লোকের প্রয়োজন, পুরো উম্মত থেকে সেই পরিমাণ লোক জিহাদি কার্যক্রমে যুক্ত থাকা ফরজে কেফায়া।

কাজি ইবনে আতিয়্যা আন্দালুসি রহ. (মৃত্যু: ৫৪১ হি.) বলেন,

"যে বিষয়টির উপর ইজমা চলে আসছে তা হল, উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি মুসলমানদের একাংশ তা আদায় করে, তাহলে অন্যদের থেকে এর দায়-ভার সরে যাবে। তবে যদি শত্রু কোনো ইসলামী ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়, তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়। -তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ: ১/২৮৯

তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয় :

১. যখন (মু'মিন-কাফের) উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন উপস্থিত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পলায়ন করা হারাম এবং অটল থেকে জিহাদ করা ফরজে আইন।

২. কাফেররা কোনো এলাকায় আক্রমণ চালালে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের উপর তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন। যদি তারা যথেষ্ট না হলে বা না করলে পর্যায়ক্রমে সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। একইভাবে কোন মুসলিম কাফেরদের হাতে বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার জন্যও এক পর্যায়ে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

৩. ইমাম যদি কোনো সম্প্রদায়কে জিহাদে বের হতে আহ্বান করেন, তাহলে তাদের সকলের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন।

*বিষয়টি হানাফি মাযহাবসহ সকল মাযহাবেই স্বীকৃত।

এক. রাণাঙ্গনে শত্রুর মুখোমুখি হলে :

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. (16) –الأنفال

"হে ঈমানদারগণ, যখন কাফেরদের চড়াও হয়ে আসা অবস্থায় তোমরা তাদের মুখোমুখি হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন অথবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।" –আনফাল: ১৫-১৬

"আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য সকল যমানার সকল মু'মিনের জন্য এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তবে কৌশল হিসেবে কিংবা মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পিছু হটলে ভিন্ন কথা।... অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হল, এই আয়াতের বিধান এখনও অপরিবর্তিত। আয়াত আম তথা ব্যাপক, খাস নয়; এবং যুদ্ধ হতে পলায়ন হারাম। এ মতটিকে এ বিষয়টিও সমর্থন করে যে, আয়াতটি বদরের দিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে।... অতএব, যুদ্ধ হতে পলায়ন করা হারাম। "

ইমাম নববী রহ (৬৭৬ হি.) বলেন-

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের দিন পলায়ন করাকে কবীরা গুনাহ গণ্য করেছেন, যা কবিরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরামের মতের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। অবশ্য হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ হতে ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর মতে এ আয়াতটি বিশেষভাবে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সঠিক মত হল যেটি **জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, আয়াতের হুকুম এখনও বহাল রয়েছে।**" -ইমাম নববী কৃত শরহে মুসলিম ২/৮

দুই. কাফেররা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলে বা আক্রমণে উদ্ধত হলে :

জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল, কাফেররা যখন মুসলমানদের কোনো এলাকায় আক্রমণ করে অথবা কোনো এলাকা দখল করে নেয় কিংবা আক্রমণে উদ্ধত হয়। তখন উক্ত এলাকার অধিবাসীদের সকলের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন হয়ে যায়।

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41). –التوبة

<u>তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।</u> এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান।" —সূরা তাওবা (০৯)

ইমাম কুরতুবী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রতিটিতেই জিহাদ ফরজে আইন।

১. যখন শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে নেয়। (بغلبة العدو على قطر من الأقطار)

২. যদি শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, তবে এখনও তা দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। (بحلوله بالعقر)

৩. যদি শত্রু আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের দিকে আসতে থাকে এবং দারুল ইসলামের কাছাকাছি এসে পড়ে।

এই সকল সূরতে জিহাদ ফরজে আইন। তা বহাল থাকবে যতক্ষণ না শত্রুকে পূর্ণ পরাস্ত করা যায় এবং দারুল ইসলাম থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা যায়।

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) বলেন,

"**সকল মুসলমানের প্রসিদ্ধ আকীদা**, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আশঙ্কা করে; আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকে; ফলে তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শঙ্কাগ্রস্ত হয়, তখন পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, শত্রুর ক্ষতি থেকে

মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে পরিমাণ লোক তাদের সাহায্যে জিহাদে বের হওয়া। এবিষয়ে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। এমন কথা কোনো মুসলমানই বলেনি যে, শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করবে, তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করবে, আর মুসলমানদের জন্য তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ হবে।" -আহকামুল কুরআন: ৪/৩১২

খ. হাদীস শরীফ

হাদীসে এসেছে-

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।" –সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩

কাজি ইয়ায রহ. (মৃত্যু: ৫৪৪ হি.) বলেন–

'যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়' -এর দু'টি সূরত রয়েছে। যদি এমন কোনো শত্রু প্রতিহত করতে আহবান করা হয়, যারা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া তাদের উপর ফরজে আইন। একইভাবে যে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছে, তাদের প্রতিহত করার জন্যে জিহাদে বের হওয়াও ফরজে আইন। এ ফরজ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয়। এই দুই সূরত ছাড়াও ইমাম যদি জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দেন, তবুও ইমামের আনুগত্যের জন্য জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। তবে এটি পূর্বোক্ত দু'টির মতো জোরদার ফরজ নয়।" -ইকমালুল মু'লিম: ৬/২৭৫

ইমাম গাযালী রহ. (৫০৫ হি.) বলেন-

"কাফিররা যদি দুয়েকজন মুসলিমকে বন্দী করে, তাহলে কি কিতাল ফরজে আইন হয়ে যাবে? যেমন তারা মুসলিম ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব কায়েম করলে ফরজে আইন হয়ে যায়? এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। তবে স্পষ্ট এটাই যে, (তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা) সম্ভব হলে ফরজে আইন হয়ে যাবে। তবে তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে আক্রমণ করা কঠিন হলে এবং অতিরিক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হলে, বিলম্ব করার কিছুটা সুযোগ আছে। কিন্তু একদম উপেক্ষা করা জায়েয নয়।" – আলওয়াসিত:৭/৫

নাফিরে আম: একটি সংশয় :

কেউ কেউ মনে করেন, 'নাফিরে আমের জন্য ইমামের পক্ষ থেকে জিহাদের আহ্বান জরুরি। ইমামের আহ্বান না হলে কাফেররা আক্রমণ চালালেও নাফিরে আম হবে না এবং ব্যাপকভাবে জিহাদও ফরজ হবে না!'

এই ধারণা ঠিক নয়। বিভিন্ন ইমামদের বক্তব্য থেকে নাফির আমের যে অর্থ দাঁড়ায় তা হল, ***'নাফির আম একটি অবস্থার নাম, যা সৃষ্টি হয় কাফেররা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করলে***

বা আক্রমণ করতে আসলে কিংবা আক্রমণ করে তা দখল করে নিলে, যখন তাদের প্রতিহত করার জন্য ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের জিহাদে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়'। এ অবস্থাকে নাফির আম বলা হয় এবং তখন ব্যাপকভাবে জিহাদ সকলের উপর ফরজ হয়ে যায়। ইমামের পক্ষ হতে আহ্বান আসতে হবে, এমন কোনো শর্ত নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন-

"যখন নাফির আম হবে; কোনো এলাকার অধিবাসীদের বলা হবে, তোমাদের জান, মাল কিংবা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের উদ্দেশ্যে শত্রুরা এসে পড়েছে, তখন পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে বের হতে কোনো সমস্যা নেই।" ***-শরহুসসিয়ারিল-কাবীর ১/১২৮***

"ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করেন, তাহলে তাদের জন্য তাঁর আদেশ অমান্য করা জায়েয নয়। তবে যদি নাফিরে আম হয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা।" ***-শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮***

"খালেকের নাফরমানী করে মাখলূকের আনুগত্য বৈধ নয়।" -মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩৪৪০৬

জিহাদে ইমামুল মুসলিমিনের নির্দেশ ঃ

অবশ্য এটা আলাদা বিষয় যে, খলিফাতুল মুসলিমিন যদি জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেন এবং জিহাদের কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য কাউকে তা থেকে বিরত রাখেন বা কাউকে অন্য কাজের হুকুম করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করা সকলের দায়িত্ব। অন্যথায় তাতে মুসলিম রাষ্ট্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, যাতে মুসলিমদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। এমন কাজ শুধু শরীয়ত নয়; সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও সমর্থন করে না। তাছাড়া জিহাদের দায়িত্ব যদিও ব্যাপকভাবে সকল মুসলিমের এবং কাঙ্খিত স্তরে তা আদায় না হলে সামর্থ্যবান সকলেই গুনাহগার হবে, কিন্তু এজাতীয় ইজতেমায়ী সকল কাজের ইন্তেজাম ও ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব ইমামুল মুসলিমিনের। তিনি যদি কাজটি আঞ্জাম দেন, অন্যদের দায়িত্ব তার নির্দেশনায় কাজ করা।

পক্ষান্তরে পরিস্থিতি যদি এমন আকস্মিক হয়, যাতে **ইমামের অনুমতি নেয়ার সুযোগ থাকে না; অনুমতি নিতে গেলে ততক্ষণে মুসলিমদের ক্ষতি হয়ে যাবে বা শত্রু হাতছাড়া হয়ে যাবে অথবা ইমাম যদি জিহাদের কাজ আঞ্জাম না দেন কিংবা মুসলিমদের কোনো ইমামই না থাকেন, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া; এমনকি তিনি নিষেধ করলে, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই দিফায়ি (প্রতিরক্ষামুলক) জিহাদ করা জরুরি। একথাও ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।**

তিন. ইমাম কাউকে জিহাদের নির্দেশ দিলে

জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার তৃতীয় ক্ষেত্র হল, ইমামুল মুসলিমীনের আদেশ। তিনি যাদেরকে জিহাদে যেতে নির্দেশ দিবেন, তাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম হল,

মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সঙ্গে বছরে অন্তত এক দুইবার জিহাদ করা ফরজে কেফায়া (অবশ্য এতে কারো কারো দ্বিমতও আছে)। যাতে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং কখনো মুসলমানদের উপর আক্রমণের সাহস না করে। এ জিহাদ যেহেতু ফরজে কেফায়া, এজন্য সকলেরই এ জিহাদে বের হওয়া না হওয়ার এখতিয়ার থাকে। কিন্তু ইমামুল মুসলিমীন যদি এ জিহাদের জন্য কিছু মুসলমানকে নির্ধারিত করে দেন, তাহলে তাদের জন্য তখন জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়।

সতর্কতা:

তবে জিহাদ মানেই না জেনে না বুঝে যখন তখন যেখানে সেখানে এলোপাতাড়ি কিছু আক্রমণ করে দেয়া নয়। এজন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট মাসআলা মাসায়েল আছে, শরীয়াহ'র সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। **জিহাদের জন্য প্রথমে জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করতে হবে। তারপর শরীয়াহ ও সমর বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে শরীয়াহ'র নীতিমালা অনুসারে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।**

জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে করণীয় ঃ

উল্লেখ্য, জিহাদ ফরজে আইন বললে কেউ কেউ মনে করেন, তাহলে আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, এই মুহূর্তেই আমাদেরকে জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে; এমনকি আমাদের যদি শত্রুর মোকাবেলা করার সমর্থ্য না থাকে, তবুও বের হতেই হবে এবং বর্তমান সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব, তাতেই কিছু একটা করে ফেলতে হবে। কারণ তা ফরজে আইন। এই ধারণা যেমন চলমান জিহাদের সমর্থক শিবিরে আছে, তেমনি বিরোধী শিবিরেও আছে। এই ধারণার ফলে বাস্তবে বেশ কিছু সমস্যাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমর্থক শিবিরে যারা এমন ধারণা লালন করেন, তারা এমন কিছু কাজ করে বসেন, যা প্রকৃত অর্থে জিহাদের জন্য ক্ষতিকর।

আর চলমান জিহাদ বিরোধী শিবিরে যারা এমন ধারণা লালন করেন যে, জিহাদ ফরজ হওয়া মানেই নগদে শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া এবং কিছু একটা করে ফেলা, তারা যেহেতু দেখেন, এই মুহূর্তে কার্যত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার মতো অবস্থা আমাদের নেই, সুতরাং তারা মনে করেন, বর্তমানে জিহাদ ফরজ এই কথাও বলা যাবে না। আমাদেরকে এখন জিহাদি সকল কার্যক্রম থেকে হাত পা গুটিয়ে দ্বীনের অন্য কাজগুলোই করে যেতে হবে।

বস্তুত দু'পক্ষের ধারণাই ভুল। এখানে শরীয়তের নির্দেশনা হল, জিহাদ ফরজ হওয়ার পর যদি শত্রুর মোকবেলা করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে অবশ্যই তাৎক্ষণিক বেরিয়ে পড়া এবং শত্রুর মোকাবেলা করা ফরজ।

পক্ষান্তরে মুসলিমদের যদি জিহাদের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সামর্থ্য অর্জন করা পর্যন্ত জিহাদ বিলম্বিত করার সুযোগ আছে। ফুকাহায়ে কেরামের অনেকেই তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

তবে এই সুযোগ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য!

তবে জিহাদ ফরজ হওয়ার পর তা বিলম্বিত করার এই সুযোগটা শুধুই প্রস্তুতি গ্রহণ ও সামর্থ্য অর্জন করার জন্য, বসে থাকার জন্য নয়। যে সামর্থ্যের অভাবে শত্রুর মোকাবেলা করা যাচ্ছে না, এসময় তা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ফরজ।

বৃদ্ধ মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তান রেখে অন্যত্র হিজরত করার কী হুকুম?

হিজরত ফরজ হওয়ার দুটি ক্ষেত্র হতে পারে। বর্তমান অবস্থানে দ্বীন ও ইজ্জত আব্রু নিরাপদ না হলে, এগুলোর নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ স্থানে হিজরত করা। দ্বিতীয়ত ফরজ জিহাদ আদায়ের জন্য জরুরি হলে হিজরত করা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, জিহাদ যেমন ফরজ, স্ত্রী সন্তানের দেখাশুনা করা এবং তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করাও ফরয। তেমনি পিতা মাতা অক্ষম হলে তাদের খেদমত ও ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করাও ফরজ। যতক্ষণ এ দুই ফরজের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব, ততক্ষণ কোনোটিই বাদ দেয়া যাবে না।

ফুকাহায়ে কেরাম যেখানে বলেছেন যে, জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে সব কিছু বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে; পিতা মাতার অনুমতিও লাগবে না- তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যখন শত্রুরা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে বসে বা তাদের ভূমিতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার আগের কোনো স্তরে থাকে, এখনো দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা তৎপর হলেই তাদের প্রতিহত করা সম্ভব।

কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এমন নয়। বরং এখানে শত্রুরা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করে দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে এবং আমরা এত দুর্বল স্তরে পৌঁছেছি যে, তাদের বিরুদ্ধে ফিলহাল আমাদের জিহাদের সামর্থ্যই নেই। এই পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে আইন ঠিক, কিন্তু জিহাদের জন্য তাৎক্ষণিক বের হয়ে পড়া ফরজ নয়; বরং এখন দায়িত্ব হল, প্রস্তুতি গ্রহণ ও সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করা। সামর্থ্য অর্জিত হলে বেরিয়ে পড়া। এ প্রস্তুতির পর্বটি যেহেতু অন্যান্য ফরজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, এজন্য প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ফরজগুলোও আদায় করে যেতে হবে। অতএব, আপনি পিতা মাতার খেদমত করুন। প্রয়োজন পড়লে ভরণ পোষণের ব্যবস্থাও করুন। পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব জিহাদের কাজ করে যান।

যুদ্ধরত কাফের রাষ্ট্রের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার বিধান ঃ

কোনো কাফেরকে হত্যা করা বৈধ হওয়া, না হওয়ার শরয়ী মানদণ্ড হলো, উক্ত কাফের হারবী কি হারবী নয়। সামরিক বা বেসামরিক হওয়ার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আর এখানে হারবী বলে উদ্দেশ্য, প্রত্যেক এমন কাফের যাদের সাথে মুসলমানদের ক. মুআহাদা তথা যুদ্ধবিরতি চুক্তি কিংবা খ. স্থায়ী আমান তথা যিম্মা চুক্তি অথবা গ. অস্থায়ী আমান তথা সাময়িক নিরাপত্তা চুক্তি নেই।

অতএব যেসব কাফের রাষ্ট্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যাদের সাথে মুআহাদা তথা আমানের চুক্তি নেই, তাদের (সামরিক-বেসামরিক) সকল কাফের নাগরিক হারবী। পঙ্গু, লেংড়া, অন্ধ কিংবা অন্য কোনো কারণে শারীরিকভাবে যুদ্ধে অক্ষম নয়; এমন সকল পুরুষকে হত্যা করা বৈধ, তারা যুদ্ধে আসুক বা না আসুক। সামরিক বাহিনীর সদস্য হোক কিংবা না হোক। অবশ্য কৌশলগত কারণে বেসামরিক লোকদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকা কাম্য কি না অথবা কাকে হত্যা করা ভালো হবে আর কাকে হত্যা না করা ভালো হবে, সেটা সমর বিশেষজ্ঞ মুজাহিদ উমারা ও উলামাগণ নির্ধারণ করবেন।

হ্যাঁ, যারা শারীরিকভাবে অক্ষম, তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ; যদি তারা কোনোভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা না করে। পক্ষান্তরে তারা যদি কোনোভাবে সহযোগিতা করে তাহলে তাদেরকেও হত্যা করা বৈধ।

এমনিভাবে সাধারণ নারীদের এবং নাবালেগ শিশুদের হত্যা করাও নিষেধ। তবে তারা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয।